ছাত্রত্ব ও শিক্ষকত্বের অধিকার বনাম ভিক্ষা ও করুণা

ফাতেমা সুলতানা শুভ্রা

শিশুকাল থেকে আমার একধরনের 'ভিক্ষুক'[১]ভীতি ছিল। ট্রেনের জানালা দিয়ে আমি দেখতে ভালোবাসতাম। ট্রেন থামলে স্টেশনে আমার তাকিয়ে দেখতে ভালো লাগত– চিপস যায়, ডিম যায়, পাখি যায়, চানাচুর যায়। আমার তীব্র ভীতি হতো তখনই যখন কোনো এক নিমগ্ন মুহূর্তে কোনো শক্তসমর্থ ভিক্ষুক জোরে বলে উঠত, 'আম্মা ভিক্ষা দেএএন না আম্মা, ভিক্ষা দেএএএন না আম্মা'।

এই ভীতির একটা ইতিহাস আছে।

আমার স্মৃতি অতটা স্বচ্ছ নয়। শুনেছি আমার বয়স যখন তিন হবে, চট্টগ্রামে থাকাকালীন আমাদের বাসার বারান্দার গ্রিলের কাছে আমাকে ডেকে কোনো এক ভিক্ষুক হাত থেকে আমার মায়ের উপহার দেওয়া এক জোড়া চুড়ি খুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। আমি তীব্র ভয়ে আম্মাকে ডাকছিলাম, আম্মা আসতে আসতে আমার হাত থেকে সোনার সে চুড়িজোড়া নিয়ে ভিক্ষুক উধাও। ভিক্ষুকের টানে আমার শিশু দুই হাতে আঘাত লেগেছিল। শিশুবেলার এই ভয় কোনোদিনই আমার পিছু ছাড়ে নাই। আমার খুব কাছাকাছি কোনো শক্তসমর্থ ভিক্ষুক এলে আমি একটু চমকে থাকি বা একটু সতর্ক থাকি, পাছে সে শরীরে হাত দেয়[২] কিংবা কিছু ধরে টান দেয়!

এই ভীতি এতটাই প্রবল যে, এখন আমি যখন সিএনজিতে গ্রিল লাগানো কায়দায় বসে থাকি, আমার খুবই ভালো লাগে। আমি ভিক্ষুক ভয় পাই, আমি শক্তসমর্থ ভিক্ষুক অপছন্দ করি এবং কাকে ভিক্ষা দেবো সেটা আমি কয়েকটা শ্রেণিতে বিভক্ত করে দেখি; যেমন, চোখ অন্ধ, হাত-পা নাই [তারপরেও চেহারার দিকে তাকাই। মনে হয় একে কি ডাকাত হিসেবে ধরে মানুষ হাত-পা কেটে দিয়েছে নাকি[৩]!], বয়স্ক মানুষ এবং মূলত (কম-বেশি) নারী ভিক্ষুকদের আমি টাকা দেই, মানে ভিক্ষা দেই।

---

[১] এখানে "ভিক্ষুক" প্রত্যয়টি যতটা না "দর্শনগতভাবে" বলছি, তার চাইতে বেশি বলছি ব্যবহারিক দিক থেকে।

[২] আমার অবশ্য এটাও মনে হয়, ভিক্ষুক দেখে নারী হিসেবে আমার নাজুক অনুভূতির কারণ এটাও যে বাংলাদেশের বাস্তবতায় শ্রেণি নির্বিশেষে কিন্তু আমার শরীরে হাত পড়ে। সেটা ভিক্ষুকের হাতও হতে পারে। এই প্রসঙ্গে অন্য কোনোদিন আলাপ করা যাবে।

[৩] অদ্ভুত যে, সামাজিক বাস্তবতায় মধ্যবিত্ত নারী আমি ডাকাত হিসেবে ধরা পড়লে মানুষ হাত-পা কেটে দেয়, ছিনতাইকারী সন্দেহে কাউকে পিটিয়ে মেরে ফেলে ইত্যাদি ইত্যাদি বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডগুলোকে কী অবলীলায় মেনে নেই।

আদতে যেটা বলতে চাইছি, যত বেশি অথর্ব হয় তত বেশি আমি সেই ভিক্ষুককে অর্থ প্রদান করতে ভালোবাসি বা তাতে ইনসাফ বোধ করি। সব ভিক্ষুককে আমি টাকা দেই না।

২.

আমার এখনকার জীবন পর্যন্ত উচ্চতর যত ক্ষুদ্র অংশের পড়াশোনা করেছি, সবই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে করেছি। স্কুল এবং কলেজে আব্বার বদলির সূত্রে আমার অনেক জায়গা বদল হয়েছে। কিন্তু সরকারি/পাবলিক স্কুল-কলেজের মাহাত্ম্য আমি বুঝি নাই। আমার প্রথম পাবলিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাহাত্ম্য বোঝাপড়া শুরু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই। জাবি নিয়ে আমার গর্বের শেষ নাই। আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকে প্রচুর শিখেছি। দারুণ দারুণ শিক্ষকদের ক্লাস পেয়েছি, উনাদের অতি চৌকষ বক্তব্য শুনেছি, অন্তর্নিহিত প্রশ্নগুলো ধরে ধরে জীবনকে বারংবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছি, অন্তত দেখবার চেষ্টা করেছি।

এই ঘুরেফিরে দেখবার প্রথম জোরালো ধাক্কা এল যখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে তৃতীয় বর্ষ শেষে চতুর্থ বর্ষে একটি গবেষণাপত্র, যাকে বিভাগের একাডেমিক কার্যক্রমে 'ডিজারটেশান' বলা হয়, সেটা সম্পাদনের ক্ষেত্রে[৪] আমার নিজ বোঝাপড়া থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ভাবলাম। আমি একধরনের 'স্টিগমাটাইজ সিচুয়েশানে'[৫] বসবাস করতাম আর আমি আমার সে সময়কার অতি পছন্দের শিক্ষক, যিনি আমাকে পড়াশোনায় স্বাভাবিক হতে খুবই উৎসাহ দিতেন, সে শিক্ষকের সাথে স্নাতক পর্যায়ের[৬] গবেষণাকাজ করতে চাইলাম। সেই শিক্ষক সে সময় নতুন যোগদান করা শিক্ষক এবং তিনি বিভাগের শিক্ষককেন্দ্রিক যে বিবিধ বিভাজন আছে, তার মধ্যে (স্বেচ্ছায় নাকি অনিচ্ছায় বসবাস করেন সে প্রসঙ্গে কোনো বক্তব্য হাজির করা আমার আগ্রহের জায়গা না) যেকোনো একটাতে ছিলেন (বলে ধরে নেওয়া হতো) এবং আমি শিক্ষার্থী হিসেবে শিক্ষকদের মধ্যে এই বিভাজন বুঝতে পারতাম না বা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলাম।

আমার পুরো গবেষণাপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটা তিক্ত বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা তৈরি হলো। আমি কোনো এক বিশেষ শিক্ষকের কাছে গবেষণাকাজ করতে চাইলাম বলে উনার এবং উনার দলের বলে বিবেচিত 'সকলের' কাছে চিহ্নিত শিক্ষার্থী হলাম। এবং এই চিহ্নিতকরণ এমনই প্রবল হলো যে, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় পর্যায়ে আমার ইচ্ছেমতোন কোর্স নিতে পারলাম না। যে কয়টা নিলাম, সেসবে আমি যতই ভালো লিখি বা মন্দ লিখি না কেন, ইনকোর্সে[৭] আমার নম্বর ক্রমাগত এক রকমই আসতে লাগল। আমি এক শিক্ষকদের একটা বিশাল অংশের কাছে 'অপছন্দের' শিক্ষার্থী হিসেবে বিবেচিত হতে লাগলাম, যদিও এদের অসংখ্যজনের কোর্স আমি দারুণ আগ্রহ নিয়ে, ভালোলাগা

[৪] সে সময়ে বিভাগীয় নীতিমালায় শিক্ষার্থী হিসেবে কোন শিক্ষকের সাথে গবেষণাকাজ করতে চাইছেন, সেটি বাছাইয়ের অধিকার প্রদত্ত ছিল।

[৫] পরিষ্কার হতে 'নারী ও প্রগতি' জার্নালে প্রকাশিত "আমি কি নারীবাদী?" প্রবন্ধটি পড়া যেতে পারে।

[৬] আমি ধর্ষণ নিয়ে আমার স্নাতক পর্যায়ের একাডেমিক গবেষণাকাজটি করতে চাইলাম এবং এই করতে চাওয়ার সাথে আমার বাছাই করা শিক্ষকের একাডেমিক দক্ষতার স্বীকৃতির কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না।

[৭] যে শিক্ষক আমার তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষকের বিপরীত রাজনৈতিক-ক্ষমতা চর্চার মধ্যে আছেন বলে চিহ্নিত তার কোর্সে।

নিয়ে পুরো বিশ্ববিদ্যালয় জীবনব্যাপী পড়তে চেয়েছিলাম। নৃবিজ্ঞানী হিসেবে আমার খানিক দক্ষতার ভিত্তি যে আমার পঠিত বিভাগের সকল শিক্ষক, এই বিশ্বাস যেন আমি ধারণ করতেই না পারি, সেজন্য বোধকরি শিক্ষকগণ তৎপর হতে লাগলেন। এই প্রেক্ষাপটে স্নাতক পর্যায়ের শেষ বছর আর স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের নানা বিন্যাস আর তার সাথে জড়িয়ে থাকা আমরা ব্যাচের মানুষজন, আমার বন্ধুদের সাথে আমার একত্রিত হয়ে করা নানা লড়াই নিয়ে ভিন্ন একটি লেখা প্রস্তাবিত হতে পারে।

সে যাই হোক, স্নাতকোত্তর পরীক্ষা দিয়ে বের হওয়া অতিশয় 'শিষ্ট' ছাত্রী আমি আমার স্নাতকোত্তর ইনকোর্সের জন্য একটি প্রবন্ধ প্রস্তুত করেছিলাম। পাস করার পর আমি সেটি গবেষণা প্রবন্ধ হিসেবে আমারই বিভাগ থেকে প্রকাশিত একাডেমিক জার্নালে ছাপানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম। আমি একজন বিজ্ঞ অধ্যাপকের কাছে সে লেখাটা নিয়ে গেলাম। লেখাটা হাতে নিয়ে আমার অগ্রজ সেই প্রফেসার বললেন, "দেখো, যে যে শব্দ ব্যবহার হয়েছে লেখায়, এগুলো তো 'সুস্থ' শব্দ না"। আমি আমার অগ্রজ অধ্যাপকের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকালাম। উনি খুব স্নেহমাখা স্বরে বললেন, "তোমার লেখাটাকে উনি[৮] 'চটির লেখা' বলেছেন"। আমি শিক্ষার্থী হিসেবে বিশাল ট্রমা নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

এই ধারাবাহিক রাজনৈতিক দলাদলির উন্মোচন তীব্রতর বিচ্ছিরি চেহারা নিল, যখন আমি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শিক্ষক' নিয়োগের 'নোংরা, কুরুচিপূর্ণ, স্থূল, অশ্লীল, লেজুড়বৃত্তিমূলক' কর্মপ্রক্রিয়ার মধ্যে অনুপ্রবেশ করলাম। আমি নিজে ধাক্কা খেয়ে (সাক্ষাৎকার বোর্ডগুলোতে কী কী পন্থায় প্রার্থীদের সাথে শিষ্টাচার-বহির্ভূত আচরণ করা হয়, সে নিয়ে একটি নৃবৈজ্ঞানিক দীর্ঘ এথনোগ্রাফিক কাজ হতে পারে। সেই 'কদর্য' আচরণের সাথে যাতে মোকাবেলা করতে না হয় সে কারণেও আমি হন্যে হয়ে লিংক খুঁজছিলাম), জেনেশুনে আমার পারিবারিক ছোটখাটো লিংক ব্যবহার করতে শুরু করলাম। তৎকালীন ভিসির খুব কাছের একজন আমার ভাবীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। সে ভদ্রলোক ভিসির সাথে পদপ্রার্থী আমাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য যেতে বললেন। আমার ভাবী সে সময় অপর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় সভাপতি। আমার আবেদনপত্র দেখে ভাবীর বন্ধুর মুখ কালো হয়ে গেল। উনি ভাইয়া ভাবীর বিয়ের সময় আমাকে ছোট দেখেছেন, একধরনের ভ্রাতৃত্বসূলভ মায়া তিনি আমার প্রতি বোধ করেন। তিনি ভাবীকে নিয়ে তাঁর কক্ষের বাইরে গেলেন, খুব গম্ভীর হয়ে কিছু বললেন। প্রথমে আমি দেখলাম, ভাবী হতবাক হয়ে গেলেন, তারপর দু'জনে একচোট হাসলেন এবং আমার কাছে আসতে আসতে তাঁরা এ মতে নিশ্চিত হলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতাবান এক অংশ আমাকে চাকুরিতে নিতে চান না। আমার বয়স সে সময় ২৬ বছর, আমার মন তখন অতি নরম। আমি হতবাক হয়ে শুনলাম, আমারই বিভাগের কোনো এক শিক্ষক আমাকে 'হোমোসেক্সচুয়াল' বলেছেন। আমার চাকুরি যেন না হয় সেজন্য ভিসির কাছে তিনি বিভাগীয় রিজারভেশানের কথা পেড়েছেন। আমার বিশেষ একটি প্রবন্ধে উল্লিখিত জাবির কোনো এক আন্দোলন-বিষয়ক লেখাকে হলুদ মার্কার

[৮] এই উনি আরো তুখোড় পণ্ডিত নৃবিজ্ঞানের, তিনি সে সময়কার বিভাগীয় ক্ষমতাবান শিক্ষকদের একজন। যে লেখাটিকে আমার বিজ্ঞ প্রফেসার চটি বই বলেছিলেন, সেটি পড়া যেতে পারে সমাজ নিরীক্ষণের ১১০ সংখ্যায়। উল্লেখ্য, লেখাটার বিষয়বস্তু ছিল ধর্ষণ-বিষয়ক গবেষণার অভিজ্ঞতা।

দিয়ে রঙিন করে ভিসির কাছে এনেছিলেন এবং তিনি বারংবার বলে গেছেন, 'আমি অসম্ভব প্রতিক্রিয়াশীল, রেডিক্যাল ও হোমোসেক্সচুয়াল'। আমি লজ্জায় অপমানে ঘেন্নায় নিচু বোধ করতে লাগলাম এবং আমার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল।

তারপরেও সাক্ষাৎকার দিতে গেলাম। সাক্ষাৎকারের আগে ভিসি যখন তার দোতলার ঘরে প্রবেশ করবেন, তখন আমি আবিষ্কার করলাম, কোনো এক কাঙ্ক্ষিত প্রার্থী ঘুরন্ত সিঁড়িতে পা ছুঁয়ে সে সময়কার ভিসিকে (ইন্টারভিউ যেন ভালো হয় সম্ভবত সে কারণেই) সালাম করে দোয়া চাইছেন। এ দৃশ্য দেখে আমার তীব্র ইচ্ছে করছিল, আমি কেন ভিসির পা-ধরাপূর্বক দোয়া চাইবার মতো 'ভালো' শিক্ষার্থী হলাম না!

সময় গড়িয়েছে। কার চাকুরি হলো আর কার হলো না এ নিয়ে আমার আদতে মাথাব্যথা দ্রুত কমতে লাগল। আমি এটা ভাবতে বসলাম যে, সামান্য এক 'বেকার শিক্ষার্থী' প্রসঙ্গে মোস্ট সিনিয়র শিক্ষকের এত সময়ক্ষেপণ করে রিজারভেশান ব্যক্ত করা, আমাকে সমকামী বলা, যদিও সমকামী-বিষমকামী-উভকামী-নাইকামী হওয়ার সাথে শিক্ষক হিসেবে শ্রেণিকক্ষে কেমন তার বিচার নির্ভর করে না, তথাপি সে শিক্ষক এত 'এফোর্ট' কেন দিলেন? উনি কি আমার মতো 'সামান্য' স্নাতকোত্তর পাস করা শিক্ষার্থী প্রসঙ্গেও 'ইনসিকিউর' বোধ করেন?

এই প্রশ্নের উত্তরই বোধকরি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সময়কার বাস্তবতা আমাকে বুঝতে সাহায্য করেছিল।

৩.

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার নিয়োগ স্বয়ং একটি 'সুপারিশভিত্তিক নিয়োগ'। আমার নিয়োগ কোনোভাবেই কেবল আমার পরীক্ষার ফলাফল, আমার প্রকাশিত প্রবন্ধ, আমার বিশ্লেষণ ধরে এগোয় নাই। আমি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম নই, কিন্তু আমার ৪টা প্রথম শ্রেণি। আমি যখন নিয়োগপ্রাপ্ত হই, তখন আমার প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা জাতীয়-আন্তর্জাতিক মিলে ৫টি। তারপরেও আমি দেখেছি আমার সরাসরি শিক্ষক নন কিন্তু অপর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েও একজন আক্ষরিকভাবেই আমার জন্য সাক্ষাৎকার বোর্ডে লড়াই করেছেন; তিনি আমার ওপর আস্থা ও বিশ্বাস রেখেছেন। আমার আশপাশের অসংখ্য সিনিয়র, শিক্ষকজন আমাকে ক্রমাগত উৎসাহ দিয়ে গেছেন যেন আমি বিমর্ষ না হই এবং তাঁরা আমার জন্য আদতেই বিভিন্ন জায়গায় সুপারিশ করেছেন। তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার কোনো সীমা নাই।

সুপারিশভিত্তিক নিয়োগ যত বেশি বুদ্ধিবৃত্তিক-দক্ষতায় হয়, তত বেশি 'স্বাধীনতা' ভোগ করা যায়– এটা আমার অদ্যাবধি বিশ্বাস[৯]। রাজনৈতিক-ব্যক্তিগত নানাবিধ কারণে যত বেশি নিয়োগ ঘটে, ততই তার ভার ভারী হতে থাকে। কারণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কেবল নিয়োগ হয়ে যাওয়ার মাধ্যমেই কারো বশ্যতা পরিমাপ করে না, নিয়োগের পর উচ্চতর পদে পদোন্নতির প্রক্রিয়াও আছে, নানাবিধ কোর্স পাওয়া না পাওয়া আছে, কমিটিতে থাকা না থাকা আছে, ভর্তিসংক্রান্ত কাজ পাওয়া না পাওয়া

[৯] এই বোধের কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নাই। এ কেবল আশাবাদ।

আছে, বিদেশে পড়তে যেতে পারা না পারা আছে, ছুটি পাওয়া না পাওয়া আছে, শিক্ষার্থী কর্তৃক নানাভাবে বিব্রত হতে না পারার বাস্তবতা তৈরির জন্য একাডেমিক সিকিউরিটি নিশ্চিত করার বিষয় আছে; সর্বোপরি বিভাগে আপনাকে কোনো কাজ দিয়ে নানারকম ফান্দে ফেলে হিন্দি সিরিয়ালের 'কুটনী নারী' যেন বানাতে না পারে সেটাকে সিকিউর করা আছে।

আর এই পুরো প্রক্রিয়ায় আমি শিক্ষার্থী থেকে যত বেশি শিক্ষক হয়েছি, আমি দেখেছি আমার অধিকারগুলো ক্রমাগত ভিক্ষায় রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে।

৪.

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় অবকাঠামোতে রাজশাহী হোক, জগন্নাথ হোক বা আমার ক্যাম্পাস জাহাঙ্গীরনগর হোক, জুবায়ের হত্যাকাণ্ডের বিচার চাওয়া হোক, রাজশাহীতে ছাত্রলীগ এবং পুলিশী গুলিবর্ষণ হোক, সানির বিরুদ্ধে কাফির বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির প্রতিবাদে একাট্টা হওয়া শিক্ষক-শিক্ষার্থীর দাবি হোক সবই কিন্তু অধিকার, অধিকার থেকে বঞ্চনার বিরুদ্ধে দাবি। কোনোটাই ভিক্ষা প্রার্থনা বা কারো কাছে করুণা চাওয়া নয়। আমরা এমন এক কিম্ভূতকিমাকার রাষ্ট্রের ততধিক কিম্ভূতকিমাকার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বসবাস করি, যেখানে জগন্নাথের মতো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক সম্পদ 'হল উদ্ধারের জন্য' শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের রাজপথে নামতে হয় এবং নামলে সম্পদ উদ্ধারের বিষয়টিকে রাষ্ট্র তার আইনশৃঙ্খলাবাহিনী দিয়ে গুলিবর্ষণ করে থামাতে চায়। কারণ আমরা অধিকারকে শিক্ষার্থী থাকার সময় থেকেই 'ভিক্ষা' হিসেবে দেখি। আমরা প্রশ্ন করতে পারি না যে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক হল বেদখল হওয়া 'রাষ্ট্রের' সিস্টেম লসের কথা বলে। আমরা এই চিন্তা করতে পারি না যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদখল করা হল উদ্ধারের জন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীর রাস্তায় নামা একটি চরম লজ্জাজনক বিষয়। আমরা এই প্রশ্নও করতে পারি না যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক সম্পদ হল উদ্ধারের জন্য জমায়েত হওয়া শিক্ষার্থী-শিক্ষকের ওপর গুলিবর্ষণ স্বয়ং রাষ্ট্রবিরোধী কাজ, রাষ্ট্র স্বয়ং এই গুলিবর্ষণের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের বিপরীতে দাঁড়িয়ে যায়।

আমার খাতার যথার্থ মূল্যায়ন হবে, এটা শিক্ষার্থী হিসেবে আমার অধিকার। কিন্তু একে আমরা অধিকার হিসেবে দেখতে পাই না, আমরা শিক্ষকের করুণা বা ভিক্ষা হিসেবে দেখি। শিক্ষক হতে চাইলে আমার শিক্ষকতা পেশায় আসবার জন্য কোনো বিশেষ সুপারিশ লাগবে না, আমার একাডেমিক দক্ষতা বিবেচিত হবে– এটা আমার অধিকার; কিন্তু কার্যত এটা ইন্টারভিউ বোর্ডের করুণা এবং ভিক্ষার ওপর নির্ভর করে। রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা, বাবা-ভাই-মামা-চাচাদের লিংক, টাকা দেওয়াদেওয়ি বা রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার ওপর নির্ভর করে। শিক্ষার্থী হিসেবে আমি হলে থাকতে পারছি না, হল আমাকে ফিরিয়ে দাও, বানিয়ে দাও– এটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অধিকার; কিন্তু এটা রাষ্ট্রের করুণার ওপর নির্ভর করে। পুলিশ গুলি কেন করল, কীসের প্রেক্ষিতে করল, কেন জগন্নাথে অজস্র টিয়ার শেল পড়ল, কেন শিক্ষার্থী ও শিক্ষক গুলি খেলো, কেন শিক্ষার্থীর চোখ অন্ধ হলো– সে বিষয়ে জানা আমার অধিকার; কিন্তু আমরা রাষ্ট্রের-সরকারের করুণার ওপর নির্ভর করি, হাত পেতে থাকি। আমার যা জানবার অধিকার তা ক্ষমতাবানের দানের

ওপর নির্ভর করে।

এবার আলোচনার একেবারে শুরুতে ফিরে যাই। ভিক্ষুক, কোন ভিক্ষুককে আমি ভিক্ষা দেই? যে যত বেশি অথর্ব, লুলা, কানা, ঠ্যাং ভাঙা, অসহায়, ভোঁতা– তাকে আমার ভিক্ষাবৃত্তির জন্য ততধিক উপযুক্ত মনে হয়। সেই একইরকম হারে এবং মানে বিশ্ববিদ্যালয়, মূলত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় অবকাঠামোতে যে শিক্ষক যত বেশি বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে লুলা-ভোঁতা তিনি তত স্মুথলি, তত দারুণ ও চৌকষভাবে ওপরে ওঠেন, তত ওপরে বসে ক্ষমতার চর্চা করতে পারেন। যে শিক্ষার্থী যত বেশি নির্বাক ও ক্ষমতাবানের ভাষায় কথা বলায় দক্ষ, সে তত বেশি মার্কস পায়।

যে শিক্ষক আর্থিকভাবে স্বাধীন, মতাদর্শিকভাবে প্রশ্ন করতে সক্ষম, একসারি তেজওয়ালা শিক্ষার্থী নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম, সেরকম শিক্ষক রাষ্ট্র, তামাশাপূর্ণ রাষ্ট্র, ক্ষমতা ও সরকার এবং ক্ষমতাবান গোষ্ঠীর জন্য হুমকিস্বরূপ। আবারও বলছি সক্ষম-তেজি-দাম্ভিক-মাথাওয়ালা শিক্ষক ক্ষমতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো স্তম্ভস্বরূপ। এত বড়ো গাটসওয়ালা শিক্ষক হজম করলে রাষ্ট্রের সকল বিশৃঙ্খলা থেমে যেতে বাধ্য। এত বড়ো দেমাগী শিক্ষার্থী, যে তার অধিকার জানে তাকে হজম করলে রাষ্ট্র সকল বেআইনি কাজ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য।

প্রশ্ন আমার নিজের কাছে, আমি কি ভিক্ষা নেব?

ফাতেমা সুলতানা শুভ্রা শিক্ষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। fatama.suvra@gmail.com